International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 108-121
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.274

একবিংশ শতাব্দীর ভারতে ডিজিটাল গণতন্ত্র, বর্ণপ্রথা এবং নাগরিকত্ব

চণ্ডী চরণ লেট

গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper explains how digital democracy, caste, and citizenship are interconnected in contemporary India. In recent years, digital technologies have rapidly expanded, and government initiatives such as Digital India and Aadhaar have transformed the functioning of governance. These programs have helped improve transparency, service delivery, and public participation. Today, many people can access information and government services more easily through digital platforms.

However, these changes have not eliminated social inequality. The caste system continues to play a significant role in Indian society. Upper-caste groups often enjoy better access to the internet, education, and digital tools, whereas many marginalized communities face difficulties in accessing digital resources. As a result, digital systems sometimes perpetuate or even intensify existing inequalities rather than reducing them.

This paper engages with the ideas of B. R. Ambedkar, Jürgen Habermas, and Michel Foucault to analyze both the positive and negative dimensions of digital democracy. While digital systems enable greater participation in various spheres, those who lack access risk being excluded from the social mainstream.

The study also examines how digital identity systems like Aadhaar are reshaping the meaning of citizenship. Increasingly, individuals are identified through data rather than rights, which can create challenges for poor and vulnerable populations.

At the same time, digital platforms are opening new avenues for Dalit movements to resist discrimination and raise awareness.

In conclusion, the paper argues for necessary reforms in digital democracy, emphasizing equality, human rights, and justice to ensure inclusive benefits for all.

Keywords: Digital democracy, caste system, citizenship, digital inequality, Aadhaar (digital identity), Dalit movement

সমস্যা:

ভারতে ডিজিটাল গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, কিন্তু জাতিগত বৈষম্য এখনও বিদ্যমান এবং ডিজিটাল প্রবেশাধিকার ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রায়শই এর পুনরুৎপাদন ঘটে। মূল প্রশ্ন হলো, ডিজিটাল ব্যবস্থাগুলি কি প্রকৃতপক্ষে সমতা সৃষ্টি করে, নাকি বর্জনকেই অব্যাহত রাখে।

পদ্ধতি:

এই প্রবন্ধে বি. আর. আম্বেদকর, ইয়ুর্গেন হাবারমাস এবং মিশেল ফুকোর ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি সরল গুণগত পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বই, প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন সমীক্ষার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুকল্পসমূহ:

১. ডিজিটাল অগ্রগতি জাতিগত বৈষম্য বৃদ্ধি করতে পারে।
২. অ্যালগরিদম সামাজিক পক্ষপাতিত্বের পুনরুৎপাদন ঘটায়।
৩. ডিজিটাল পরিচয়পত্র নাগরিকত্বকে একটি তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে।
৪. অনলাইন পরিসর সকলের জন্য সমানভাবে প্রবেশযোগ্য নয়।
৫. দলিত ডিজিটাল সক্রিয়তা প্রতিরোধের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ভূমিকা: ডিজিটাল ভারত এবং সমতার প্রশ্ন:

গত দুই দশকে ভারতে ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এটি মানুষের জীবনযাপন, যোগাযোগ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার পদ্ধতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেছে। একই সঙ্গে, এটি দৈনন্দিন জীবনে গণতন্ত্র চর্চার ধরনকেও নতুন রূপ দিয়েছে। ৮০ কোটিরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী থাকায় ভারতকে প্রায়শই বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। স্মার্টফোন, সাশ্রয়ী ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যম মানুষের জন্য পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন, মতামত বিনিময় এবং তথ্য সংগ্রহকে আরও সহজ করে তুলেছে।

ভারত সরকার এই ডিজিটাল রূপান্তরকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে। শাসনব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর এবং সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'মাইগভ' এবং 'আধার'-এর মতো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় পরিষেবাগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজে পৌঁছে দেওয়া। পাশাপাশি, দুর্নীতি হ্রাস করা এবং বৃহত্তর জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমানে বহু নাগরিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নথিপত্রের জন্য আবেদন, কল্যাণমূলক সুবিধা গ্রহণ এবং সরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

তবুও, ভারতের সামাজিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এই পরিবর্তনগুলোকে বোঝা সম্ভব নয়। ভারতীয় সমাজ এখনও গভীরভাবে অসম এবং জাতিভেদ প্রথা মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে চলেছে। এটি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাপ্তিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। ফলে, ডিজিটাল প্রযুক্তির সুফল সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয় না। কিছু মানুষের কাছে উন্নত ডিভাইস, স্থিতিশীল ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিজিটাল দক্ষতা সহজলভ্য হলেও, অন্যদের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

এই প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয় যে, ডিজিটাল সম্প্রসারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে এটি সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানকে আরও প্রসারিত করতে পারে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষেরা সাধারণত ডিজিটাল পরিবর্তনের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী অবস্থানে থাকেন, যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নানা কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হয়। এমনকি যখন ডিজিটাল পরিষেবাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে উপলব্ধ থাকে, তখনও সেগুলো সকলের জন্য সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য হয় না। এই অর্থে, ডিজিটাল গণতন্ত্র একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বর্জনমূলক বৈশিষ্ট্য বহন করে।

এই প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: ডিজিটাল গণতন্ত্র কি বৃহত্তর সামাজিক সমতা সৃষ্টি করে, নাকি এটি নতুন ডিজিটাল পরিসরে বর্ণবৈষম্যকে পুনরুৎপাদন করে? এই প্রশ্নটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ প্রযুক্তিকে প্রায়শই অগ্রগতির একটি নিরপেক্ষ হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি সমাজে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকেই প্রতিফলিত ও পুনরুৎপাদন করে।

এই আলোচনাটি বি. আর. আম্বেদকরের চিন্তাধারার আলোকে পরিচালিত, যিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে গণতন্ত্র কেবল রাজনৈতিক অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; বরং এর ভিত্তি হতে হবে সামাজিক সমতা। আম্বেদকরের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র কেবল নির্বাচন বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিষয় নয়, বরং এমন একটি সমাজ নির্মাণের প্রক্রিয়া, যেখানে সকল মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতে ডিজিটাল গণতন্ত্র এখনও অসম্পূর্ণ। এটি নিঃসন্দেহে যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং সুযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, কিন্তু সমাজের গভীরতর বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়নি। বরং কিছু ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থাগুলো বর্জনের নতুন রূপ সৃষ্টি করেছে, বিশেষত সেইসব জনগোষ্ঠীর জন্য যারা আগে থেকেই সামাজিকভাবে বঞ্চিত।

এই কারণে, ডিজিটাল গণতন্ত্রকে কেবল একটি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তবেই সমসাময়িক ভারতে এর সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা উভয়ই যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

তাত্ত্বিক কাঠামো: আম্বেদকর, হাবারমাস এবং ফুকো:

আম্বেদকর: সামাজিক গণতন্ত্র এবং সমতা

বি. আর. আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে কখনও একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, গণতন্ত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। ভোটাধিকারের মতো রাজনৈতিক অধিকার গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সমাজ যদি অসাম্য থাকে, তবে তা প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এই যুক্তিটি ভারতের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেখানে বর্ণপ্রথা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক জীবনে গভীর অসমতা সৃষ্টি করে এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে কিছু গোষ্ঠী অধিক ক্ষমতা, সম্মান ও সুযোগ ভোগ করেছে, অন্যদিকে অন্যদের প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

আম্বেদকর যুক্তি দিয়েছিলেন যে, গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উচিত। তাঁর মতে, এই মূল্যবোধগুলো কেবল সংবিধানের ভাষা বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং এগুলো দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। যদি বর্ণবৈষম্য অব্যাহত থাকে, তবে গণতন্ত্র কেবল আনুষ্ঠানিক রূপেই সীমাবদ্ধ থাকে। এটি কাগজে-কলমে বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হয় না। বর্তমান ডিজিটাল গণতন্ত্রকে বোঝার ক্ষেত্রে এই অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম দৃষ্টিতে, ডিজিটাল গণতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্তিমূলক বলে মনে হতে পারে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল পরিষেবাগুলো আপাতদৃষ্টিতে সকলের জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু এই বাহ্যিক চিত্রটি অনেক সময় বিভ্রান্তিকর। প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার যেমন সবার জন্য সমান নয়, তেমনি তা কার্যকরভাবে ব্যবহারের সক্ষমতাও সমানভাবে বণ্টিত নয়। শিক্ষা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, সামাজিক আত্মবিশ্বাস এবং বস্তুগত সম্পদ—এই সমস্ত উপাদান নির্ধারণ করে দেয় কারা প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রায়শই একাধিক কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হয়।

ফলস্বরূপ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাহ্যিকভাবে সার্বজনীন মনে হলেও বাস্তবে তা গভীরভাবে অসম রয়ে যায়। আম্বেদকরের ধারণা আমাদের বুঝতে সহায়তা করে যে, প্রকৃত ডিজিটাল গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বিস্তারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা যায় না; বরং এটি সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করছে, নাকি তা আরও বৃদ্ধি করছে—এই প্রশ্নের ভিত্তিতেও এর বিচার করা প্রয়োজন।

হাবারমাস: ডিজিটাল যুগে জনপরিসর:

ইয়ুর্গেন হাবারমাস জনপরিসরের ধারণাকে এমন একটি সামাজিক ক্ষেত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যেখানে নাগরিকরা যুক্তিসংগত আলোচনার মাধ্যমে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মতামত বিনিময় করে এবং সম্মিলিত জনমত গঠন করে। এই পরিসরের মূল ভিত্তি হলো সমতা, স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং যুক্তিনির্ভর সংলাপ। হাবারমাসের মতে, একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জনপরিসর অপরিহার্য, যেখানে সকল নাগরিক সমান শর্তে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন।

ডিজিটাল যুগে সামাজিক মাধ্যম, ব্লগ এবং অনলাইন আলোচনা ফোরামের উত্থান এই জনপরিসরের পরিধিকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো তথ্যপ্রবাহকে দ্রুততর করেছে, মতপ্রকাশকে আরও সহজলভ্য করেছে এবং নাগরিকদের সরাসরি জনবিতর্কে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। ফলে, এগুলোকে অনেক সময় একটি নতুন, গতিশীল এবং অধিকতর উন্মুক্ত জনপরিসর হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা গণতান্ত্রিক চর্চাকে শক্তিশালী করতে সক্ষম।

তবে এই আশাব্যঞ্জক চিত্রের অন্তরালে একাধিক সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। বাস্তবে ডিজিটাল জনপরিসর সমানভাবে সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। এতে অংশগ্রহণের ক্ষমতা আয়, শিক্ষা, ভাষাগত দক্ষতা, প্রযুক্তিগত প্রবেশাধিকার এবং সামাজিক অবস্থানের মতো বিভিন্ন কাঠামোগত উপাদানের উপর নির্ভর করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলি সাধারণত এই পরিসরে নিজেদের মতামত কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে অধিকতর সক্ষম, কারণ তাদের কাছে উন্নত প্রযুক্তি, ডিজিটাল দক্ষতা এবং আত্মপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক পুঁজি বিদ্যমান। বিপরীতে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রায়শই এই সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে, যার ফলে তাদের কণ্ঠস্বর দুর্বল বা অদৃশ্য থেকে যায়।

এর পাশাপাশি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো প্রায়ই একটি বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে ট্রোলিং, অনলাইন হয়রানি, বিদ্বেষমূলক ভাষা এবং বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রচলিত। এই ধরনের অভিজ্ঞতা বিশেষত নারী, দলিত এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের জন্য অংশগ্রহণকে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিরুৎসাহজনক করে তোলে। ফলস্বরূপ, ডিজিটাল জনপরিসরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তাত্ত্বিকভাবে বিদ্যমান থাকলেও, বাস্তবে তা অসমভাবে বণ্টিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে ডিজিটাল জনপরিসর যোগাযোগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করলেও, এটি হাবারমাসের কল্পিত সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জনপরিসরের আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং, এটি বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যকে নতুন রূপে প্রতিফলিত ও পুনরুৎপাদন করে। ফলে, ডিজিটাল পরিসরে কার কণ্ঠস্বর প্রাধান্য পাবে এবং কারা প্রান্তিক হয়ে থাকবে—তা এখনও বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে।

ফুকো: ক্ষমতা, নজরদারি এবং ডেটা:

মিশেল ফুকো আমাদের বুঝতে সহায়তা করেন যে আধুনিক সমাজে ক্ষমতা কেবল বলপ্রয়োগ বা দৃশ্যমান কর্তৃত্বের মাধ্যমেই কাজ করে না; বরং এটি প্রায়শই সূক্ষ্ম এবং দৈনন্দিন অনুশীলনের মাধ্যমে কার্যকর হয়।

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান, জ্ঞানব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই প্রেক্ষিতে ফুকো 'গভর্নমেন্টালিটি' বা 'শাসনব্যবস্থা' ধারণাটি ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে বোঝানো হয় কীভাবে বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোটি ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ডিজিটাল যুগে বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ, ডেটা সংগ্রহ এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মতো প্রযুক্তিগুলো প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আধার-এর মতো ডিজিটাল পরিচয়ব্যবস্থা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তা নাগরিকদের শনাক্ত করার জন্য ব্যবহার করে। এর ফলে মানুষ ক্রমবর্ধমানভাবে ডেটার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব লাভ করছে এবং তাদের পরিচয় ডিজিটাল রেকর্ড ও ডেটাবেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়ছে।

এ ধরনের ব্যবস্থা শাসনব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও সংগঠিত করতে সহায়তা করতে পারে। এটি দ্রুত পরিষেবা প্রদান এবং প্রশাসনিক সমন্বয় উন্নত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তবে এর সঙ্গে গুরুতর উদ্বেগও জড়িত। যখন ব্যক্তিগত ডেটা ধারাবাহিকভাবে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তখন গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিকরা সম্পূর্ণভাবে অবগত থাকেন না যে তাদের ডেটা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, কারা তা ব্যবহার করছে, বা এই ডেটার ভিত্তিতে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এই উদ্বেগগুলো আরও তীব্র। তাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই ভুল তথ্য সংশোধন করা, নজরদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা নিজেদের অধিকার রক্ষা করার সুযোগ সীমিত থাকে। ফলে, ডিজিটাল ব্যবস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকির নতুন রূপ সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি যখন সেগুলোকে নিরপেক্ষ বা দক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

ফুকোর তত্ত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা কখনোই কেবল প্রযুক্তিগত বিষয় নয়; এটি মূলত একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এটি এমন এক ক্ষমতার কাঠামোর মাধ্যমে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও রূপায়িত করে, যা প্রায়শই কার্যকারিতা ও অগ্রগতির ভাষার আড়ালে আচ্ছাদিত থাকে।

ভারতে ডিজিটাল গণতন্ত্রের বিবর্তন:

ভারতে ডিজিটাল গণতন্ত্র কোনো আকস্মিক উদ্ভবের ফল নয়; বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও ধাপে ধাপে বিকাশমান প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। এই বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায় একদিকে যেমন শাসনব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করেছে, অন্যদিকে তেমনি নতুন ধরনের বৈষম্য ও বর্জনের সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছে।

প্রথম পর্যায়টি ই-গভর্নেন্সের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত, যার সূচনা ১৯৯০-এর দশক থেকে এবং ২০০০-এর দশকের প্রারম্ভে তা আরও সুসংহত রূপ পায়। এই সময়ে রাষ্ট্র প্রশাসনিক কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে, যার ফলে জনসেবা প্রদানের পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। নাগরিকরা ধীরে ধীরে অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা—যেমন নথিপত্রের জন্য আবেদন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ এবং তথ্য প্রাপ্তি—সম্পন্ন করার সুযোগ পান। এর ফলে প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, সময় ও ব্যয়ের সাশ্রয় হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বচ্ছতাও উন্নত হয়। তবে এই অগ্রগতির সুফল সমানভাবে বণ্টিত হয়নি; ডিজিটাল অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে বহু নাগরিক এই ব্যবস্থার বাইরে রয়ে যান।

দ্বিতীয় একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক উত্থান ঘটে যা জনপরিসর ও রাজনৈতিক যোগাযোগের প্রকৃতিকে আমূল পরিবর্তন করে। ফেসবুক, টুইটার এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো

প্ল্যাটফর্মগুলো নাগরিকদের মতপ্রকাশ, জনমত গঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠনের নতুন ক্ষেত্র প্রদান করে। এই ডিজিটাল মাধ্যমগুলো তথ্যপ্রবাহকে দ্রুততর ও বহুমাত্রিক করে তোলে এবং নাগরিকদের সরাসরি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করে। ফলে, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের একটি নতুন, অধিক গতিশীল রূপের উদ্ভব ঘটে।

তৃতীয় পর্যায়টি 'অ্যালগরিদমিক শাসন'-এর উত্থানের মাধ্যমে চিহ্নিত, যা বিশেষত সাম্প্রতিক দশকে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পর্যায়ে শাসনব্যবস্থা ক্রমবর্ধমানভাবে ডেটা-নির্ভর ও স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। আধার-এর মতো ডিজিটাল পরিচয়ব্যবস্থা নাগরিক শনাক্তকরণ এবং কল্যাণমূলক পরিষেবা বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে কাজ করছে। এই ব্যবস্থাগুলো প্রশাসনিক দক্ষতা, লক্ষ্যভিত্তিক পরিষেবা প্রদান এবং সমন্বয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও, একই সঙ্গে গোপনীয়তা, নজরদারি, তথ্যের নিরাপত্তা এবং জবাবদিহিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে।

এই সামগ্রিক রূপান্তরের কেন্দ্রে রয়েছে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচি, যার লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, ইন্টারনেট প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং নাগরিককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। তবুও, এই অগ্রগতির সুফল সমাজের সকল স্তরে সমানভাবে পৌঁছায়নি। শহুরে ও সামাজিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলো সাধারণত এই পরিবর্তন থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে, যেখানে গ্রামীণ, দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এখনও নানা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন।

ফলত, স্পষ্ট যে ভারতের ডিজিটাল গণতন্ত্রের বিবর্তন একদিকে যেমন সম্ভাবনাময়, তেমনি তা গভীর বৈষম্যপূর্ণ। ডিজিটাল প্রযুক্তি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেও, এর সুফল ও অভিজ্ঞতা সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। ফলে, ভারত যখন ক্রমশ ডেটা-চালিত শাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন প্রযুক্তি, ক্ষমতা এবং সামাজিক অসমতার আন্তঃসম্পর্ককে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

জাতিভেদ প্রথা এবং ডিজিটাল বৈষম্য

কাঠামোগত বৈষম্য

ভারতে ডিজিটাল বৈষম্য কেবল প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার ফল নয়; বরং এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃহত্তর কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং ডিজিটাল দক্ষতার সুযোগ জাতি, শ্রেণি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বৈষম্যগুলো ডিজিটাল পরিসরে বিলুপ্ত হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে নতুন রূপে পুনরুৎপাদিত হয়।

উচ্চবর্ণের মানুষেরা সাধারণত ডিজিটাল প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার এবং তা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বেশি পেয়ে থাকেন। তারা প্রায়শই উচ্চ আয়, উন্নত শিক্ষা এবং শক্তিশালী সামাজিক পুঁজির সুবিধা ভোগ করেন। তারা এমন এলাকায় বসবাস করেন যেখানে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ, উন্নত ইন্টারনেট সংযোগ এবং শক্তিশালী অবকাঠামো বিদ্যমান। এই সমস্ত উপাদান তাদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ এবং জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারকে সহজতর করে।

এর বিপরীতে, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির বহু মানুষ এখনও গুরুতর সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন। অনেকের জন্য স্মার্টফোন, ইন্টারনেট সংযোগ এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যয় একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে গেছে। গ্রামীণ অঞ্চলে দুর্বল নেটওয়ার্ক কভারেজ এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামো অতিরিক্ত সমস্যা সৃষ্টি

করে। পাশাপাশি, ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগও প্রায়শই সীমিত। এই পরস্পর-সংযুক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলোর ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বহু ব্যক্তি ডিজিটাল পরিষেবার পূর্ণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন।

সুরিন্দর যোধকা উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক ভারতেও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ডিজিটাল ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা বিদ্যমান। সামাজিক অবস্থান এখনও নির্ধারণ করে দেয় কে সম্পদে প্রবেশাধিকার পাবে, কে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং কে প্রযুক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে।

এর ফলে স্পষ্ট হয় যে, ডিজিটাল সম্প্রসারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈষম্য হ্রাস করে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে এটি বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও সুসংহত করে। যারা ইতিমধ্যেই সুবিধাপ্রাপ্ত, তারা ডিজিটাল পরিবর্তনের সুফল গ্রহণের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে। অন্যদিকে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অসম পরিস্থিতিতে থেকেই সমান প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয়।

এই প্রেক্ষাপটে, ডিজিটাল বিভাজনকে কেবল পরিকাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত সমস্যা হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; এটি মূলত সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রকৃত ডিজিটাল সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনো উদ্যোগকে অবশ্যই সেই গভীর কাঠামোগত বৈষম্যগুলোকে মোকাবিলা করতে হবে, যা ভারতীয় সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করে আসছে।

ডিজিটাল বর্ণবাদ:

অনলাইন জগৎকে প্রায়শই উন্মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক পরিসর হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই পরিসর বৈষম্যমুক্ত নয়। বর্ণভিত্তিক গালিগালাজ ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এখন বহু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, বিশেষ করে দলিতরা, প্রায়শই অনলাইনে অপমান, হুমকি, ট্রোলিং এবং সামাজিক বর্জনের শিকার হন।

থেনমোঝি সৌন্দরারাজন উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণভিত্তিক বিদ্বেষ কেবল অফলাইন সমাজে সীমাবদ্ধ নয়; এটি উদ্বেগজনকভাবে ডিজিটাল জগতেও বিস্তার লাভ করেছে। এই পর্যবেক্ষণটি নির্দেশ করে যে, ইন্টারনেট সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নিরপেক্ষ ক্ষেত্র নয়; বরং এটি সেইসব সামাজিক কুসংস্কার, ক্ষমতার সম্পর্ক এবং শ্রেণিবিন্যাসকে প্রতিফলিত ও পুনরুৎপাদন করে, যা মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতা করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো প্রায়শই এই ধরনের বৈষম্য মোকাবেলায় পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত নয়। সামাজিক মাধ্যম সংস্থাগুলো ক্ষতিকর বিষয়বস্তু শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদমিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে এই সিস্টেমগুলো ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সবসময় কার্যকর হয় না। বিশেষত, আঞ্চলিক ভাষা, স্থানীয় অপভাষা বা সাংকেতিক প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত বর্ণবিদ্বেষ অনেক সময় এই ব্যবস্থাগুলোর নজর এড়িয়ে যায়।

এই প্রেক্ষিতে "অ্যালগরিদমিক অন্ধত্ব" ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি সেই সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করে, যেখানে ডিজিটাল অ্যালগরিদম নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক বৈষম্য সঠিকভাবে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। যখন প্ল্যাটফর্মগুলো জাতিগত বা বর্ণভিত্তিক নির্যাতন চিহ্নিত করতে পারে না, তখন ক্ষতিকর বিষয়বস্তু অনলাইনে থেকে যায় এবং তা আরও বিস্তার লাভ করে। এর ফলে ভুক্তভোগীরা প্রায়শই পর্যাপ্ত সুরক্ষা, ন্যায়বিচার বা সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।

তবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে শুধুমাত্র ক্ষতির ক্ষেত্র হিসেবে দেখা একপাক্ষিক হবে। একই সঙ্গে এগুলো প্রতিরোধ, মতপ্রকাশ এবং সংহতির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও কাজ করতে পারে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো

ক্রমবর্ধমানভাবে এই পরিসর ব্যবহার করছে নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে, বৈষম্যের ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করতে এবং জবাবদিহিতার দাবি উত্থাপন করতে।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ডিজিটাল পরিসর এক ধরনের বৈপরীত্য বহন করে। একদিকে এটি দৃশ্যমানতা, মতপ্রকাশ এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে; অন্যদিকে এটি নতুন রূপে বর্জন ও বৈষম্যকেও পুনরুৎপাদন করে। ফলে স্পষ্ট হয় যে, শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যের সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, কার্যকর নীতিনির্ধারণ এবং ডিজিটাল পরিসরে জাতিভিত্তিক বৈষম্য সম্পর্কে গভীরতর সমালোচনামূলক বোঝাপড়া।

তথ্যের যুগে নাগরিকত্ব:
আধার এবং তথ্য-কেন্দ্রিক নাগরিকত্ব

তথ্য-নির্ভর শাসনের দিকে ভারতের অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো আধার ব্যবস্থা। শাসনব্যবস্থাকে আরও দ্রুত, কার্যকর এবং সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। আঙুলের ছাপ এবং আইরিস স্ক্যানের মতো বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহার করে আধার নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় নথি, কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত করে।

একদিকে, এই ব্যবস্থাটি প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজতর করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটি একাধিক গুরুতর সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। অনেক সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটি, দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ বা তথ্যের অসামঞ্জস্যতার কারণে মানুষ নিজেদের পরিচয় যাচাই করতে ব্যর্থ হন। এই ধরনের ব্যর্থতার ফলে এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে, কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা খাদ্য রেশন, পেনশন, ভর্তুকি কিংবা অন্যান্য অপরিহার্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

রীতিকা খেরা দেখিয়েছেন যে, এই ধরনের বঞ্চনা কোনো সাধারণ প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফল নয়; বরং এটি দরিদ্র ও প্রান্তিক নাগরিকদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে, যারা দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তার উপর নির্ভরশীল। অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি ব্যবস্থা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বর্জনের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে কিছু গবেষক যুক্তি দিয়েছেন যে নাগরিকত্বের ধারণাই ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। ভি. সুব্রামানিয়ানের মতে, নাগরিকত্বকে আর কেবল আইনি বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়; বরং এটি ক্রমবর্ধমানভাবে ডিজিটাল ডেটার মাধ্যমে নির্ধারিত ও মধ্যস্থতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অন্য কথায়, রাষ্ট্র তখনই একজন ব্যক্তিকে কার্যকরভাবে স্বীকৃতি দেয়, যখন তার তথ্য ডিজিটাল ব্যবস্থার মধ্যে সঠিকভাবে সংরক্ষিত, সনাক্ত এবং যাচাইযোগ্য হয়।

এই পরিবর্তন নাগরিকত্বের ধারণায় একটি মৌলিক রূপান্তর নির্দেশ করে। নাগরিকত্ব এখন আর কেবল অধিকার বা পরিচয়ের বিষয় নয়; এটি প্রযুক্তিগত স্বীকৃতির সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। যদি কোনো ব্যক্তির তথ্য অনুপস্থিত, ভুল বা যাচাইযোগ্য না হয়, তবে তার অধিকার প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। ফলে, ডিজিটাল যুগে ন্যায্যতা, সমতা এবং গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটছে।

নজরদারি এবং ডেটা-নির্ভর আধিপত্য:

শাসনব্যবস্থা যত বেশি ডিজিটাল হচ্ছে, নজরদারির পরিসরও তত বিস্তৃত হয়ে উঠছে। সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এখন বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। এই তথ্যের মধ্যে পরিচয়সংক্রান্ত বিবরণ, অবস্থানগত তথ্য, পরিষেবা ব্যবহারের রেকর্ড এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপের ধরণ

অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থাগুলো নাগরিকদের পর্যবেক্ষণ, অনুসরণ এবং নিয়ন্ত্রণকে আরও সহজতর করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে উষা রমনাথন আধার ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের ডেটা-নির্ভর ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে এবং একই সঙ্গে নাগরিকের গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসনকে দুর্বল করে। যখন ব্যক্তিগত তথ্য শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করে, তখন ক্ষমতার ভারসাম্য প্রায়শই নাগরিকদের কাছ থেকে সরে গিয়ে রাষ্ট্র ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এই আলোচনায় ডেটা-নির্ভর আধিপত্য ধারণাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণা এমন একটি পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে, যেখানে রাষ্ট্র ও কর্পোরেশনসহ ক্ষমতাশালী পক্ষগুলো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করে। ঐতিহ্যগত ঔপনিবেশিকতার মতোই, যেখানে জমি, শ্রম ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতো, সমসাময়িক সময়ে ডেটা-নির্ভর আধিপত্য তথ্য, জ্ঞান এবং মানুষের ডিজিটাল অস্তিত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্যকর হয়।

তবে এই প্রক্রিয়ার প্রভাব সমাজের সকল স্তরে সমান নয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রায়শই অধিক মাত্রায় নজরদারির আওতায় আসে এবং ডেটার অপব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে তথ্য-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সক্ষমতাও সীমিত থাকে। ফলে, ডিজিটাল ব্যবস্থাগুলো অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসের পরিবর্তে তা আরও তীব্র করে তুলতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট যে, ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয় নয়; এটি গোপনীয়তা, ক্ষমতার বণ্টন এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। অতএব, ডিজিটাল ব্যবস্থাকে এমনভাবে নির্মাণ ও পরিচালনা করা প্রয়োজন, যাতে তা নাগরিকদের আরও অরক্ষিত না করে বরং তাদের অধিকার, নিরাপত্তা এবং মর্যাদাকে সুরক্ষিত করে।

ডিজিটাল রাজনীতি এবং দলিত প্রতিরোধ:

দলিত ডিজিটাল সক্রিয়তা

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো প্রতিরোধ এবং আত্মপ্রকাশের জন্য নতুন পরিসর উন্মোচন করেছে। ভারতে দলিত সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক মাধ্যম ও অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে বৈষম্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে, সেই বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে। এই প্রবণতাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মূলধারার গণমাধ্যম ও প্রচলিত জনপরিসরে দলিতদের কণ্ঠস্বর দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত, বিকৃত বা প্রান্তিকীকৃত হয়েছে।

দলিত ক্যামেরা-র মতো প্ল্যাটফর্ম এবং #DalitLivesMatter-এর মতো ডিজিটাল আন্দোলনের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি, সচেতনতা গঠন এবং প্রভাব সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এগুলো ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া, অবিচারের ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করা এবং প্রভাবশালী বয়ানের বাইরে থাকা প্রশ্নগুলো সামনে নিয়ে আসার সুযোগ প্রদান করে। পাশাপাশি, এই প্ল্যাটফর্মগুলো দ্রুত তথ্য প্রচার এবং ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর জনসমাজের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এই ডিজিটাল পরিসরগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– এগুলো প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে আত্মপ্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দেয়। অন্যের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব হওয়ার পরিবর্তে, তারা নিজেদের কণ্ঠে

নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারে। এর ফলে জনবিতর্কের কাঠামো ও ভাষ্য উভয়ই পরিবর্তিত হয় এবং জাতি, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলোকেও চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব হয়।

এই প্রক্রিয়াটি ন্যান্সি ফ্রেজারের 'সাবঅল্টার্ন কাউন্টার-পাবলিকস' (অধস্তন প্রতি-জনপরিসর) ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। ফ্রেজারের মতে, প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো যখন প্রভাবশালী জনপরিসর থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তারা নিজেদের বিকল্প আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে। দলিত ডিজিটাল সক্রিয়তা সেই অর্থে একটি বিকল্প জনপরিসর নির্মাণ করে, যেখানে উপেক্ষিত কণ্ঠস্বরগুলো সংগঠিত হতে, মতবিনিময় করতে এবং স্বীকৃতির দাবি উত্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ডিজিটাল সক্রিয়তা সংহতি গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষ অভিন্ন অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের ভিত্তিতে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এই সংযোগবোধ রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে সম্মিলিত সচেতনতা এবং কখনও কখনও সংগঠিত প্রতিরোধে রূপান্তরিত করে।

রাজনৈতিক সংহতি:

ডিজিটাল প্রযুক্তি ভারতে রাজনৈতিক চর্চার প্রকৃতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে সামাজিক মাধ্যম, মেসেজিং অ্যাপ এবং অনলাইন প্রচারাভিযান ব্যবহার করছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো তাদেরকে বিস্তৃত জনসমাজের কাছে পৌঁছাতে, নেতাদের প্রচার করতে, জনমত গঠন করতে এবং রাজনৈতিক অভিমতকে প্রভাবিত করতে সহায়তা করে।

এই পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যোগাযোগের গতি ও তাৎক্ষণিকতা। রাজনীতিবিদরা এখন আর সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত গণমাধ্যমের উপর নির্ভরশীল নন; বরং তারা সরাসরি নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন, এবং নাগরিকরাও তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হন। এর ফলে রাজনৈতিক পরিসরে প্রকাশ্য উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

তবে এই অংশগ্রহণের গণতান্ত্রিক তাৎপর্যকে অতিরঞ্জিত করা সমীচীন নয়। সাইমন চৌচার্ড যুক্তি দিয়েছেন যে, ডিজিটাল সম্পৃক্ততার একটি বড় অংশ প্রকৃত অর্থে রূপান্তরমূলক না হয়ে প্রতীকী পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষ সামাজিক মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু পছন্দ, শেয়ার, মন্তব্য বা প্রচার করতে পারে, কিন্তু এই কর্মকাণ্ডগুলো সবসময় তাদের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব পরিবর্তন ঘটায় না।

অনেক ক্ষেত্রে, ডিজিটাল রাজনীতি কাঠামোগত পরিবর্তনের তুলনায় দৃশ্যমানতাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। অনলাইন প্রচারাভিযানগুলো অন্তর্ভুক্তির একটি বাহ্যিক চিত্র তৈরি করতে পারে, কিন্তু গভীরতর বৈষম্যগুলো অপরিবর্তিত থেকে যায়। রাজনৈতিক প্রচারাভিযানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি দৃশ্যমান হতে পারে, কিন্তু নীতি-নির্ধারণ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের উদ্বেগ ও দাবি সবসময় প্রতিফলিত হয় না।

এই বাস্তবতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার দিকে ইঙ্গিত করে। ডিজিটাল প্রযুক্তি যোগাযোগকে সহজতর ও বিস্তৃত করতে সক্ষম হলেও, কেবল যোগাযোগের প্রসার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে না। প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য এমন রূপান্তরমূলক পরিবর্তন প্রয়োজন, যা কেবল প্রতিনিধিত্বের স্তরেই সীমাবদ্ধ না থেকে ক্ষমতার কাঠামোর গভীরে প্রভাব বিস্তার করে।

আন্তঃসম্পর্ক: লিঙ্গ, বর্ণ এবং ডিজিটাল বৈষম্য:

ডিজিটাল বৈষম্য সকলের দ্বারা একইভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ হয় না। প্রান্তিক নারীদের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা প্রায়শই আরও বহুমাত্রিক এবং জটিল। তারা একই সঙ্গে বর্ণ ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের সম্মুখীন হন, যা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না; বরং একে অপরকে শক্তিশালী করে তোলে।

অনেক পরিবার ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা এখনও চলাচল, যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিনিষেধের সম্মুখীন হন। অনেক সময় তাদের অবাধে মোবাইল ফোন ব্যবহার বা তত্ত্বাবধান ছাড়া অনলাইন পরিসরে সময় ব্যয় করার সুযোগ দেওয়া হয় না। কিছু ক্ষেত্রে পরিবারগুলো কন্যাদের তুলনায় পুত্রদের শিক্ষা ও ডিজিটাল সুযোগকে বেশি অগ্রাধিকার প্রদান করে। এর ফলে শৈশব থেকেই ডিজিটাল জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস এবং সুযোগের ক্ষেত্রে একটি অসম বণ্টন গড়ে ওঠে।

এমনকি যখন নারীরা ডিজিটাল পরিসরে প্রবেশ করেন, তখনও সেই পরিবেশ সবসময় নিরাপদ থাকে না। অনেক নারী অনলাইনে হয়রানি, নির্যাতন, ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকির সম্মুখীন হন। প্রান্তিক নারীদের ক্ষেত্রে এই বৈরিতা বর্ণ ও লিঙ্গ—উভয় ধরনের বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা তাদের অংশগ্রহণকে আরও জটিল এবং মানসিকভাবে ক্লান্তিকর করে তোলে। শর্মিলা রেগের কাজ এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে, যেখানে জাতিভেদ প্রথা ও পিতৃতন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া নারীদের অভিজ্ঞতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

তবে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। বহু প্রান্তিক নারী এই পরিসরগুলো ব্যবহার করছেন নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে, সহিংসতা ও বর্জনের বিরুদ্ধে কথা বলতে এবং দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে। তারা ডিজিটাল মাধ্যমকে কেবল আত্মপ্রকাশের জন্য নয়, বরং সমর্থনের নেটওয়ার্ক গঠন এবং সম্মিলিত সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও ব্যবহার করছেন।

এই প্রেক্ষাপটে, ডিজিটাল পরিসরগুলো আন্তঃবিভাগীয় সক্রিয়তার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এখানে নারীরা বর্ণ ও লিঙ্গকে পৃথক সমস্যা হিসেবে না দেখে, তাদের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন।

সুতরাং, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো একদিকে যেমন দুর্বলতার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে প্রতিরোধ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করতে পারে। যদিও এখনও বহু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে, তবুও এই অনলাইন পরিসরগুলো প্রকাশ্য উপস্থিতি, মতপ্রকাশ এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার জন্য নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রান্তিক নারীদের জন্য এই সম্ভাবনাগুলো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

অ্যালগরিদমিক শাসন এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকি:

শাসনব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অ্যালগরিদম-ভিত্তিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিয়ে নতুন উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে। এই ব্যবস্থাগুলোকে প্রায়শই বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং কার্যকর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়; তবে বাস্তবে এগুলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। এগুলোর কার্যপ্রণালী নির্ভর করে যে ডেটার উপর এগুলো নির্মিত এবং নকশাগতভাবে যে অনুমান ও মানদণ্ড এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তার উপর।

সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যান্ড সোসাইটির গবেষণা ইঙ্গিত করে যে, অ্যালগরিদমিক ব্যবস্থা বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য দূর করার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে তা পুনরুৎপাদন করে। যদি এই ব্যবস্থাগুলোকে এমন ডেটার ভিত্তিতে প্রশিক্ষিত করা হয়, যা ইতিমধ্যেই জাতিগত বা সামাজিক পক্ষপাতিত্ব বহন করে, তবে তাদের

উৎপন্ন ফলাফলও পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রক্রিয়ায় বৈষম্য ডিজিটাল সিদ্ধান্তগ্রহণের কাঠামোর মধ্যেই নিহিত হয়ে যেতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো স্বচ্ছতার অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ নাগরিক জানেন না এই ব্যবস্থাগুলো কীভাবে কাজ করে বা কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে, অন্যায্য বা বৈষম্যমূলক ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এবং জবাবদিহিতা দাবি করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে, অ্যালগরিদমিক শাসনের প্রসার ঘটাতে হলে তা জনপর্যবেক্ষণ ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখা যায় না। বরং প্রয়োজন শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামো, স্বচ্ছ কার্যপ্রণালী এবং সমতাভিত্তিক নকশা। প্রযুক্তি কেবল কার্যকারিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; এটিকে ন্যায়সংগত, জবাবদিহিমূলক এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল হতে হবে।

ডিজিটাল নাগরিকত্বের পুনর্কল্পনা: একটি আম্বেদকরীয় দৃষ্টিকোণ:

ডিজিটাল গণতন্ত্রের একটি অধিকতর সমতাভিত্তিক রূপকে অবশ্যই সেই মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, যেগুলোকে বি. আর. আম্বেদকর সাংবিধানিক নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে সমতা, ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং সকল মানুষের প্রতি সম্মান। আম্বেদকরের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র কখনোই কেবল প্রতিষ্ঠান বা আইনি কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ সমান মর্যাদার ভিত্তিতে সহাবস্থান করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে, একটি ন্যায়সংগত ডিজিটাল ব্যবস্থা কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর সূচনা হতে হবে সমান প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নাগরিকেরই ইন্টারনেট, ডিজিটাল ডিভাইস এবং সেগুলোকে অর্থবহভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। এই মৌলিক শর্তগুলো পূরণ না হলে ডিজিটাল নাগরিকত্ব শুরু থেকেই বৈষম্যমূলক হয়ে পড়বে।

ডিজিটাল পরিসরকে নিরপেক্ষ বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়; বরং সেখানে বিদ্যমান বর্ণভিত্তিক বৈষম্যকে স্বীকার করা এবং তা মোকাবিলা করা অপরিহার্য। অনলাইন হয়রানি, বর্জন এবং অ্যালগরিদমিক পক্ষপাতিত্বের মতো সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে শক্তিশালী ও দায়বদ্ধ সুরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডিজিটাল সিস্টেমের নকশা। ডেটা ও অ্যালগরিদমের মাধ্যমে যখন ক্রমবর্ধমান ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, তখন এই ব্যবস্থাগুলোর ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এগুলোকে এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যাতে তা জনপর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং নতুন প্রযুক্তিগত কাঠামোর মাধ্যমে পুরোনো বৈষম্য পুনরুৎপাদন না করে।

এছাড়া, অর্থবহ অংশগ্রহণের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকদের কেবল ডেটা-নির্ভর সত্তা বা ডিজিটাল পরিষেবার নিষ্ক্রিয় ব্যবহারকারী হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়; বরং তাদেরকে আলোচনায়, নীতি-নির্ধারণে এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

এই অর্থে, ডিজিটাল নাগরিকত্বকে কেবল ডেটা, পরিচয় বা প্রযুক্তিগত প্রবেশাধিকারের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা যথেষ্ট নয়। এর ভিত্তি হওয়া উচিত অধিকার, মর্যাদা, সমতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ। একটি আম্বেদকরীয় দৃষ্টিকোণ আমাদের ডিজিটাল গণতন্ত্রকে কেবল প্রযুক্তিগত প্রকল্প হিসেবে নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি চলমান সংগ্রাম হিসেবে কল্পনা করতে সহায়তা করে।

উপসংহার:

ভারতে ডিজিটাল গণতন্ত্র সমসাময়িক শাসনব্যবস্থা, যোগাযোগ কাঠামো এবং নাগরিক অংশগ্রহণের প্রকৃতিতে একটি গভীর রূপান্তর সূচিত করেছে। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যাপক বিস্তারের ফলে তথ্যপ্রাপ্তি, জনপরিসরে মতামত প্রকাশ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অধিক সহজ ও দ্রুততর হয়েছে। পাশাপাশি, ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও আধার-এর মতো সরকারি উদ্যোগ প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিষেবা প্রদানের গতি ত্বরান্বিতকরণ এবং শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে নিহিত কাঠামোগত বৈষম্য–বিশেষত জাতিভেদ প্রথা– অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিসরেও নতুন রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং জনপরিসরে মতপ্রকাশের সুযোগ–এই সমস্ত ক্ষেত্রেই সামাজিক অবস্থান এখনও একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। ফলে, ডিজিটাল রূপান্তরের সুফল সমানভাবে বণ্টিত হয় না; বরং এটি অনেকাংশে বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও সুসংহত করে।

এই বাস্তবতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ডিজিটাল গণতন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমতা বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না। অনলাইন পরিসর যেমন নতুন অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে, তেমনি এটি জাতিভিত্তিক বৈষম্য, বর্জন এবং সহিংসতার ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করতে পারে। একইভাবে, আধার-এর মতো তথ্য-নির্ভর শাসনব্যবস্থা প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করলেও, যখন নাগরিক অধিকারের প্রাপ্তি ডিজিটাল যাচাই ও তথ্য-নির্ভর স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন তা নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা ও প্রান্তিকীকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে, ডিজিটাল পরিসর প্রতিরোধ, সংহতি এবং বিকল্প জনপরিসর গঠনের ক্ষেত্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা বহন করে। দলিত ডিজিটাল সক্রিয়তা এবং অন্যান্য প্রান্তিক আন্দোলন প্রমাণ করে যে, প্রযুক্তি কেবল ক্ষমতার উপকরণ নয়; এটি প্রতিরোধ ও পুনর্গঠনের মাধ্যমও হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক স্বীকৃতির দাবি উত্থাপনের নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে, ডিজিটাল গণতন্ত্রকে একটি ন্যায়সংগত ও সবচেয়ে উপযুক্ত রূপ দিতে হলে, একে অবশ্যই সমতা, ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং দায়বদ্ধতার মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এখানে আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি গণতন্ত্রকে কেবল রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে নয়, বরং সামাজিক সম্পর্কের একটি ন্যায়সঙ্গত রূপ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। সেই অর্থে, ডিজিটাল গণতন্ত্রকেও কেবল প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ বা প্রশাসনিক দক্ষতার পরিমাপে মূল্যায়ন করা যথেষ্ট নয়; বরং এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সেই সামাজিক বাস্তবতাগুলোকে, যা নির্ধারণ করে কারা, কীভাবে এবং কতটা অংশগ্রহণ করতে সক্ষম।

সুতরাং, ভারতে ডিজিটাল গণতন্ত্র একাধারে সম্ভাবনা, দ্বন্দ্ব এবং রূপান্তরের একটি ক্ষেত্র। এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই ব্যবস্থাকে কতটা সমতাভিত্তিক, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ এবং সামাজিকভাবে ন্যায়সংগত করে তোলা যায়, তার উপর। প্রযুক্তি তখনই প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে, যখন তা সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য ন্যায়সঙ্গত সুযোগ, মর্যাদা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

১. Ambedkar, B. R. (2016). Annihilation of caste: The annotated critical edition (S. Anand, Ed.). Verso. (Original work published 1936)
২. Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage.
৩. Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere. Social Text, (25/26), 56–80.
৪. Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. MIT Press.
৫. Jodhka, S. S. (2017). Caste in contemporary India. Routledge.
৬. Khera, R. (2019). Dissent on Aadhaar. Orient Blackswan.
৭. Paik, S. (2023). The Dalit women's movement in India. Sage.
৮. Mukherjee, S. (2025). Algorithmic bias and discrimination: Legal accountability of AI systems. International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences, 13(4). https://doi.org/10.37082/IJIRMPS.v13.i4.232659
৯. Chauchard, S. (2017). Why representation matters. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316421864
১০. Oxfam India. (2022, December 5). India inequality report 2022: Digital divide. https://www.oxfamindia.org/knowledgehub/workingpaper/india-inequality-report-2022-digital-divide
১১. NIIT Foundation. (2024, June 12). Bridging the digital divide: Empowering rural India. https://niitfoundation.org/bridging-the-digital-divide-empowering-rural-india/
১২. Poushter, J., Gubbala, S., & Austin, S. (2024, February 5). 8 charts on technology use around the world. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/02/05/8-charts-on-technology-use-around-the-world/
১৩. Banerjee, A. (2023, September 4). India: The surveillance state and the role of Aadhaar. Countercurrents. https://countercurrents.org/2023/09/04/india-the-surveillance-state-and-the-role-of-aadhaar/
১৪. National Campaign on Dalit Human Rights. (2024). Caste-based abuse report. http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2024/04/Caste-Based-Abuse-Report.pdf
১৫. Raman, B., & Thomas, J. (2024). Digital identity systems, surveillance, and welfare: Examining Aadhaar in India. Indian Journal of Human Development. https://doi.org/10.1177/09717218241281940
১৬. Udupa, S. (2021). Digital technology and extreme speech: Approaches to counter online hate (Commissioned Research Paper for the United Nations Peacekeeping Technology Strategy). UnitedNations Peacekeeping. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/digital_technology_and_extreme_speech_udupa_17_sept_2021.pdf